



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1172 - 1179

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

গ্রিনল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা : ন্যাটোর প্রতি চ্যালেঞ্জ এবং বৈশ্বিক রাজনীতির দ্বিচারিতা

পাপু হাজার

স্যান্ট (শ্রেণি- ১), রাষ্ট্রবিজ্ঞান

গুসকরা মহাবিদ্যালয়

Email ID: papu@gushkaramahavidyalaya.ac.in

 0009-0005-2182-1267

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Greenland, U.S.
Strategic Interests,
Arctic Geopolitics,
NATO Unity,
Global Power
Politics, Strategic
Resources, Double
Standards in
International
Relations, Rule-
Based International
Order.

Abstract

This paper examines the growing strategic interest of the United States in Greenland and its broader implications for NATO unity and global power politics. Although Greenland is a self-governing territory under the sovereignty of Denmark, recent geopolitical developments particularly in the Arctic have brought it to the center of U.S. strategic calculations. The paper seeks to answer four key questions: why the United States has shown renewed interest in capturing or politically absorbing Greenland, what strategic and natural resources Greenland holds, how such ambitions risk undermining NATO cohesion, and what global shifts may follow if the United States succeeds in asserting control.

The study argues that U.S. interest in Greenland is driven primarily by Arctic militarization, climate change, and great power competition. Melting ice has opened new sea routes and access to vast reserves of rare earth minerals, hydrocarbons, and critical resources essential for advanced technologies and defense industries. Greenland's geographic location also provides strategic leverage over the Arctic and the North Atlantic, reinforcing U.S. missile defense and surveillance capabilities.

However, the paper highlights that any U.S. attempt to annex or dominate Greenland would pose a serious challenge to NATO unity. Denmark's membership in NATO means that pressure on Greenland by a fellow ally exposes contradictions within the alliance, weakening its normative foundations based on sovereignty, collective security, and mutual trust. Such actions risk setting a precedent that internal power asymmetries within NATO can override international norms.

More critically, the paper situates the Greenland issue within the broader framework of double standards in global politics. While the United States condemns Russia's security-based justification for territorial control in Ukraine, its own strategic logic toward Greenland reflects a similar realist

approach. This selective application of norms undermines the credibility of the liberal international order.

Finally, the paper contends that a successful U.S. takeover of Greenland would accelerate global power shifts, intensify Arctic competition, normalize territorial revisionism by great powers, and further erode the rule-based international system. Greenland thus emerges not merely as a territorial issue, but as a symbol of the changing dynamics of twenty-first-century geopolitics.

Discussion

ভূমিকা : গ্রিনল্যান্ড বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ এবং এটি উত্তর আটলান্টিক ও আর্কটিক অঞ্চলের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এর ভৌগোলিক অবস্থান একে সামরিক, বাণিজ্যিক ও কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আর্কটিক মহাসাগরের নিকটবর্তী হওয়ায় গ্রিনল্যান্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ মানে উত্তর গোলার্ধে নজরদারি, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা এবং নৌ চলাচলের উপর প্রভাব বিস্তার করা (Dodds 41)। আইনগতভাবে গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের সার্বভৌমত্বের অধীনে একটি স্বশাসিত অঞ্চল। ২০০৯ সালের Self-Rule Act অনুযায়ী গ্রিনল্যান্ড নিজস্ব অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করলেও পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা এখনো ডেনমার্কের হাতে ন্যস্ত (Gad 118)। ফলে গ্রিনল্যান্ডের বিষয়ে যেকোনো বহিরাগত চাপ সরাসরি ডেনমার্ক ও ন্যাটোর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে।

বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আর্কটিক অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলছে, যা নতুন সমুদ্রপথ ও বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের দ্বার খুলে দিচ্ছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে আর্কটিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে নতুন ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে (Young 7)। এই প্রেক্ষাপটে ২০১৯ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড 'কেনার' প্রস্তাব আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। যদিও প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল হয়, তবুও এটি যুক্তরাষ্ট্রের গভীর কৌশলগত আগ্রহকে স্পষ্ট করে তোলে (BBC News)।

এই গবেষণার মূল সমস্যা হল কেন যুক্তরাষ্ট্র একটি ন্যাটো-ভুক্ত মিত্র রাষ্ট্র ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের উপর প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা আগ্রহী। যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশল ন্যাটোর পারস্পরিক আস্থা, সার্বভৌমত্বের সম্মান এবং নৈতিক ভিত্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলে, যা জোটটির অভ্যন্তরীণ ঐক্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত আগ্রহের পেছনের কারণ বিশ্লেষণ করা, ন্যাটোর ভেতরে শক্তির অসমতা ও সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব অনুধাবন করা এবং বৈশ্বিক রাজনীতিতে বিদ্যমান দ্বিচারিতার বাস্তবতা তুলে ধরা। এই গবেষণা চারটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে - যুক্তরাষ্ট্র কেন গ্রিনল্যান্ডের প্রতি নতুন করে আগ্রহ দেখাচ্ছে? গ্রিনল্যান্ডের কোন কৌশলগত ও প্রাকৃতিক সম্পদ যুক্তরাষ্ট্রকে আকৃষ্ট করছে? এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ন্যাটোর ঐক্যের জন্য কতটা হুমকিস্বরূপ? এবং যুক্তরাষ্ট্র সফল হলে বৈশ্বিক রাজনীতিতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে?

গবেষণাটি গুণগত পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। এখানে বাস্তববাদ, উদারবাদ ও সমালোচনামূলক ভূ-রাজনীতির তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে একাডেমিক জার্নাল, নীতিনির্ধারণী নথি ও ন্যাটোর সরকারি দলিল ব্যবহৃত হয়েছে।

এই গবেষণা আর্কটিক স্ট্যাডিজি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করে, ন্যাটো ও জোট রাজনীতির অন্তর্নিহিত সংকট বোঝাতে সহায়তা করে এবং সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

গ্রিনল্যান্ড : ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও আইনি প্রেক্ষাপট : গ্রিনল্যান্ডকে ঘিরে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক টানা পোড়েন হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি; এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, জটিল রাজনৈতিক কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক আইনের সূক্ষ্ম প্রশ্ন। এই অধ্যায়ে গ্রিনল্যান্ডের ঐতিহাসিক শাসনব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক আইনি প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গ্রিনল্যান্ডের ইতিহাসে ইউরোপীয় প্রভাব শুরু হয় দশম শতকে, যখন নরওয়েজিয়ান ভাইকিংরা দ্বীপটিতে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে এটি নরওয়ে রাজ্যের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৩৮০ সালে ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজনৈতিক সংযুক্তির পর গ্রিনল্যান্ড কার্যত ডেনিশ-নরওয়েজিয়ান শাসনের অধীনে আসে (Gad 117)।

১৮১৪ সালের Kiel চুক্তির মাধ্যমে নরওয়ে ডেনমার্ক থেকে পৃথক হলেও গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের অধীনেই থেকে যায়। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গ্রিনল্যান্ড ছিল একটি উপনিবেশিক অঞ্চল, যেখানে ডেনমার্কের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। ১৯৫৩ সালে ডেনমার্কের সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে গ্রিনল্যান্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডেনমার্ক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ফলে এর উপনিবেশিক মর্যাদা বিলুপ্ত হয় (Ackren 92)। এই অন্তর্ভুক্তি গ্রিনল্যান্ডের আন্তর্জাতিক আইনি অবস্থানকে নতুন মাত্রা দেয়।

ডেনমার্কের অংশ হওয়া সত্ত্বেও গ্রিনল্যান্ড দীর্ঘদিন ধরেই অধিক রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে আসছে। এর ফলস্বরূপ ১৯৭৯ সালে 'হোম রুল আইন' কার্যকর হয়, যার মাধ্যমে গ্রিনল্যান্ড নিজস্ব সংসদ ও সরকার গঠনের অধিকার লাভ করে (Gad 120)। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এই স্বায়ত্তশাসন আরও বিস্তৃত হয় ২০০৯ সালের 'Self-Government Act'-এর মাধ্যমে। এই আইনে গ্রিনল্যান্ডের জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত রাখা হয় (Ackren 95)। তবে পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা এবং মুদ্রানীতি এখনো ডেনমার্কের হাতে রয়ে গেছে। এই সীমাবদ্ধতাই গ্রিনল্যান্ডকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি সংবেদনশীল ও কৌশলগত অঞ্চলে পরিণত করেছে। আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অঞ্চলিক অখণ্ডতা জাতিসংঘ সনদের একটি মৌলিক নীতি। জাতিসংঘ সনদের ২(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের উপর বলপ্রয়োগ বা হুমকি প্রদান নিষিদ্ধ (UN Charter 3)। একই সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত। গ্রিনল্যান্ডের ক্ষেত্রে এই দুটি নীতির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম টানাপোড়েন বিদ্যমান। একদিকে গ্রিনল্যান্ডের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ বৃহৎ শক্তির কৌশলগত নিয়ন্ত্রণের আগ্রহ আন্তর্জাতিক আইনের নৈতিক ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে (Dodds 44)।

ঠান্ডা যুদ্ধের সময় গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিশেষ কৌশলগত গুরুত্ব লাভ করে। উত্তর মেরুর নিকটবর্তী হওয়ায় গ্রিনল্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নজরদারির জন্য আদর্শ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে থুলে এয়ার বেস প্রতিষ্ঠিত হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কতা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ (Young 9)। ১৯৫১ সালের যুক্তরাষ্ট্র-ডেনমার্ক প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে এই সামরিক উপস্থিতি আইনি বৈধতা পায়। যদিও এটি ন্যাটোর সামরিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়, বাস্তবে এটি গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক কৌশলের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করে দেয়।

একবিংশ শতাব্দীতে গ্রিনল্যান্ডের কৌশলগত গুরুত্ব : একবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ধীরে ধীরে আর্কটিক অঞ্চলের দিকে সরে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং মহাশক্তিগুলোর প্রতিযোগিতা গ্রিনল্যান্ডকে নতুন করে বৈশ্বিক কৌশলগত মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। গ্রিনল্যান্ড এখন আর শুধু একটি স্বশাসিত দ্বীপ নয়; বরং এটি সামরিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর কিছু সময় আর্কটিক অঞ্চল তুলনামূলকভাবে শান্ত ছিল। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অঞ্চলে সামরিকীকরণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন - তিনটি শক্তিই আর্কটিকে নিজেদের উপস্থিতি জোরদার করছে। রাশিয়া আর্কটিক উপকূলে একাধিক সামরিক ঘাঁটি পুনর্গঠন করেছে এবং আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে (Young 10)।

যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডকে আর্কটিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করছে। থুলে এয়ার বেস এখনো যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কতা ও মহাকাশ নজরদারি ব্যবস্থার অন্যতম কেন্দ্র (Dodds 45)। অন্যদিকে চীন নিজেকে 'Near-Arctic State' হিসেবে ঘোষণা করে আর্কটিক গবেষণা ও পরিকাঠামো বিনিয়োগের মাধ্যমে কৌশলগত

প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে (Lanteigne 88)। এই প্রতিযোগিতা গ্রিনল্যান্ডকে অনিবার্যভাবে সামরিক কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আর্কটিক অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলছে, যা বৈশ্বিক বাণিজ্য ও নৌ চলাচলের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনছে। আগে যেখানে আর্কটিক মহাসাগর বছরের অধিকাংশ সময় বরফে ঢাকা থাকত, এখন সেখানে মৌসুমি হলেও নৌ চলাচল সম্ভব হচ্ছে (AMAP 14)।

উত্তর মেরু নৌপথ (Northern Sea Route) এবং সম্ভাব্য ট্রান্স-পোলার রুট এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যকার দূরত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিতে পারে। এর ফলে সুয়েজ খাল বা মালাক্কা প্রণালীর মতো প্রচলিত নৌপথের ওপর নির্ভরতা কমবে। এই নতুন নৌপথগুলোর ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রিনল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে (Young 11)।

গ্রিনল্যান্ডের আরেকটি বড় কৌশলগত গুরুত্ব এর প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে জড়িত। বরফ গলার ফলে দ্বীপটির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা বিপুল খনিজ সম্পদ এখন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। গ্রিনল্যান্ডে বিরল খনিজ উপাদান (Rare Earth Elements)-এর উল্লেখযোগ্য মজুত রয়েছে, যা আধুনিক প্রযুক্তি, সামরিক সরঞ্জাম ও নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য অপরিহার্য (Ackren 97)। এছাড়া ইউরেনিয়াম, তেল ও গ্যাসের সম্ভাব্য মজুত গ্রিনল্যান্ডকে শক্তি রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র করে তুলেছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি, উইন্ড টারবাইন ও সৌরশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় খনিজের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনল্যান্ডের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে (Dodds 46)। এই সম্পদ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শক্তির আগ্রহকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

গ্রিনল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থান একে সামরিক কৌশলের দিক থেকে অনন্য করে তুলেছে। বিশেষ করে GIUK Gap-গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যের মধ্যবর্তী সমুদ্রপথ-উত্তর আটলান্টিকে নৌ ও সাবমেরিন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Gad 123)। এই অঞ্চলের ওপর নজরদারি প্রতিষ্ঠা মানে রাশিয়ার নৌবাহিনীর আটলান্টিক প্রবেশপথ পর্যবেক্ষণ করা। একই সঙ্গে গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ। এই ভৌগোলিক বাস্তবতাই যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রিনল্যান্ডের প্রতি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত আগ্রহী করে তুলেছে।

গ্রিনল্যান্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা : গ্রিনল্যান্ডকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত আগ্রহ কোনো নতুন ঘটনা নয়। তবে একবিংশ শতাব্দীতে এই আগ্রহ আরও স্পষ্ট, সংগঠিত ও বহুমাত্রিক রূপ নিয়েছে। সামরিক নিরাপত্তা, প্রযুক্তিগত আধিপত্য এবং বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত চিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে।

ঠান্ডা যুদ্ধ পর্বে গ্রিনল্যান্ড ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্ভাব্য আক্রমণ পর্যবেক্ষণের জন্য থুলে এয়ার বেস যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কতা ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করত (Young 9)। ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর কিছু সময় এই আগ্রহ কমে গেলেও, উত্তর- ঠান্ডা যুদ্ধ পর্বে নতুন করে আর্কটিকের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ২০১০ সালের পর জলবায়ু পরিবর্তন ও চীনের উত্থান যুক্তরাষ্ট্রকে আর্কটিক অঞ্চলের দিকে পুনরায় মনোযোগ দিতে বাধ্য করে। এই প্রেক্ষাপটে ২০১৯ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড 'কেনার' প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত মানসিকতাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে। যদিও প্রস্তাবটি ডেনমার্ক সরকার প্রত্যাখ্যান করে, তবুও এটি স্পষ্ট করে দেয় যে যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডকে নিছক মিত্র রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে নয়, বরং একটি কৌশলগত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে (Dodds 47)।

গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের একটি প্রধান কারণ হল চীনের আর্কটিক কৌশল মোকাবিলা করা। চীন নিজেকে 'Near-Arctic State' ঘোষণা করে গ্রিনল্যান্ডে খনিজ খনন, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে (Lanteigne 90)। যুক্তরাষ্ট্র এই প্রবণতাকে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখে। একই সঙ্গে রাশিয়ার আর্কটিক অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্বেগ করেছে। রাশিয়া আর্কটিক উপকূলে নতুন ঘাঁটি স্থাপন

এবং পারমাণবিক সক্ষম সাবমেরিন মোতায়েনের মাধ্যমে শক্তি প্রদর্শন করছে (Young 11)। গ্রিনল্যান্ডে প্রভাব বজায় রেখে যুক্তরাষ্ট্র এই রুশ প্রভাব সীমিত করতে চায়।

এছাড়া প্রতিরক্ষা শিল্প ও উচ্চপ্রযুক্তিগত স্বার্থও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত যুক্তির অংশ। ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা, স্যাটেলাইট নজরদারি এবং মহাকাশ নিরাপত্তার জন্য গ্রিনল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত আধিপত্য বজায় রাখতে সহায়ক (Dodds 48)।

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল সবসময় সরাসরি ভূখণ্ড দখলের দিকে ধাবিত নয়। বরং আধুনিক কৌশলে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা আরও কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, পরিকাঠামো সহায়তা এবং খনিজ খাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে চায় (Ackren 99)। নিরাপত্তা নির্ভরতার মাধ্যমেও যুক্তরাষ্ট্র আধিপত্য বজায় রাখে। প্রতিরক্ষা চুক্তি ও সামরিক সহযোগিতার ফলে গ্রিনল্যান্ড কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পাশাপাশি কূটনৈতিক চাপ ও ন্যাটো কাঠামোর ভেতর প্রভাব খাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নিজের কৌশলগত স্বার্থ সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে (Gad 124)।

গ্রিনল্যান্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে ডেনমার্ক সরকার স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। ট্রাম্পের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ডেনমার্ক ঘোষণা করে যে গ্রিনল্যান্ড 'বিক্রয়ের জন্য নয়' এবং এটি ডেনিশ সার্বভৌমত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ (BBC News)। গ্রিনল্যান্ডের ভেতরেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। একদিকে কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে দেখে, অন্যদিকে অনেকেই এটিকে নতুন ধরনের আধিপত্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য হুমকি বলে মনে করে (Ackren 101)। এই দ্বন্দ্ব গ্রিনল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পথকে আরও জটিল করে তুলেছে।

সংকটের মুখে ন্যাটো : জোট রাজনীতি ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব : গ্রিনল্যান্ড ইস্যু ন্যাটোর জন্য একটি সাধারণ আঞ্চলিক বিরোধ নয়; বরং এটি জোট রাজনীতির গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বকে উন্মোচিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ন্যাটোর মৌলিক নীতি, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক আস্থা এবং জোটের নৈতিক ভিত্তিকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠার সময় ন্যাটোর প্রধান লক্ষ্য ছিল সমষ্টিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ন্যাটোর বিখ্যাত আর্টিকেল ৫ অনুযায়ী, কোনো সদস্য রাষ্ট্রের উপর আক্রমণকে সকল সদস্যের উপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করা হয় (NATO Handbook 27)। এই নীতি জোটের পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার ভিত্তি। একই সঙ্গে ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব ও আনুষ্ঠানিক সমতার নীতিকে স্বীকৃতি দেয়। তাত্ত্বিকভাবে ছোট ও বড় রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো শ্রেণিবিন্যাস থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির পার্থক্য ন্যাটোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অসম প্রভাব সৃষ্টি করে (Webber 63)।

ডেনমার্ক ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম এবং উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে এর ভৌগোলিক অবস্থান ন্যাটোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের সার্বভৌম অংশ হওয়ায়, এটি পরোক্ষভাবে ন্যাটোর কৌশলগত পরিধির মধ্যেও পড়ে। আর্টিকেল ৫-এর আলোকে ডেনমার্ক আশা করে যে জোট তার সার্বভৌম স্বার্থ রক্ষায় পাশে দাঁড়াবে। তবে বাস্তবতা হল যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রভাবশালী সদস্যের চাপের মুখে ডেনমার্কের অবস্থান তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি ন্যাটোর ভেতরে শক্তির অসমতা ও রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি স্পষ্ট উদাহরণ (Gad 125)।

গ্রিনল্যান্ড ইস্যু ন্যাটোর ইতিহাসে একটি অস্বস্তিকর দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে, যেখানে একটি মিত্র রাষ্ট্র অন্য একটি মিত্র রাষ্ট্রের সার্বভৌম অঞ্চলের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান ন্যাটোর নৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে দুর্বল করে এবং জোটের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে (Dodds 50)। যদি ন্যাটোর ভেতরে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের কৌশলগত স্বার্থে ছোট রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করে, তবে জোটের ঘোষিত নীতি ও বাস্তব আচরণের মধ্যে স্পষ্ট ফাঁক তৈরি হয়। এই দ্বৈততা ন্যাটোর আদর্শিক ভিত্তিকে ক্ষয় করে এবং ভবিষ্যতে জোটের কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে।

গ্রিনল্যান্ড ইস্যু ন্যাটোর ছোট সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটি সতর্কবার্তা। এটি দেখায় যে সংকটের সময় জোটের ভেতরে আনুষ্ঠানিক সমতা থাকলেও বাস্তব নিরাপত্তা নিশ্চয়তা কতটা অনিশ্চিত হতে পারে। এর ফলে ছোট রাষ্ট্রগুলোর

মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি হয় এবং তারা বিকল্প নিরাপত্তা কৌশল বিবেচনা করতে বাধ্য হতে পারে (Webber 70)। একই সঙ্গে এই পরিস্থিতি শক্তিশালী নেতৃত্বের Coercive প্রবণতাকে স্বাভাবিক করে তোলে, যেখানে জোট কাঠামোকে ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তার করা হয়। দীর্ঘমেয়াদে এটি ন্যাটোর ঐক্য দুর্বল করে এবং জোট রাজনীতিকে আরও ভঙ্গুর করে তুলতে পারে।

বৈশ্বিক রাজনীতির দ্বিচারিতা : যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও নির্বাচিত নীতি প্রয়োগ : গ্রিনল্যান্ড ইস্যু কেবল আর্কটিক ভূ-রাজনীতির প্রশ্ন নয়; এটি সমসাময়িক বৈশ্বিক রাজনীতিতে নীতি ও বাস্তবতার মধ্যকার দ্বিচারিতাকে স্পষ্ট করে তোলে। বিশেষ করে ইউক্রেন সংকটকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র যে নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছে, গ্রিনল্যান্ড প্রসঙ্গে তার বাস্তববাদী যুক্তির সঙ্গে তুলনা করলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি গভীর বৈপরীত্য উন্মোচিত হয়।

ইউক্রেন সংকটে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিকতার প্রধান রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বয়ানে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা একটি অখণ্ড নীতি হিসেবে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এবং শক্তির মাধ্যমে সীমান্ত পরিবর্তনের বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (Mearsheimer 78)। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা রাশিয়ার নিরাপত্তা - ভিত্তিক যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, কোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা উদ্বেগ অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করার অজুহাত হতে পারে না। এই অবস্থান উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রচার করা হয়েছে (Ikenberry 56)।

গ্রিনল্যান্ড প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভাষ্য ভিন্ন সুরে কথা বলে। এখানে সার্বভৌমত্ব বা আত্মনিয়ন্ত্রণের নৈতিক প্রশ্ন গৌণ হয়ে নিরাপত্তা ও কৌশলগত অপরিহার্যতা প্রধান হয়ে ওঠে। আর্কটিক অঞ্চলে চীন ও রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধিকে যুক্তরাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করে এবং গ্রিনল্যান্ডকে সেই হুমকি মোকাবিলার একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বর্ণনা করে (Dodds 52)। এই যুক্তিতে গ্রিনল্যান্ডের জনগণের রাজনৈতিক ইচ্ছা বা ডেনমার্কের সার্বভৌম অধিকার দ্বিতীয় স্থানে চলে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য কার্যত বাস্তববাদী চিন্তাধারার প্রতিফলন, যেখানে শক্তি, ভূগোল ও নিরাপত্তা নৈতিকতার ওপর প্রাধান্য পায় (Gad 128)।

ইউক্রেন ও গ্রিনল্যান্ড দুটি ক্ষেত্রেই কৌশলগত যুক্তির মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনে ন্যাটোর সম্প্রসারণকে নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে দেখেছে; যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডে চীন ও রাশিয়ার উপস্থিতিকে একইভাবে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেছে (Mearsheimer 81)। উভয় ক্ষেত্রেই 'জাতীয় নিরাপত্তা' প্রধান যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে নৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ইউক্রেন প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিকতার ভাষায় কথা বললেও, গ্রিনল্যান্ড প্রসঙ্গে সেই একই নীতির প্রয়োগে অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এই দ্বৈত আচরণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক নেতৃত্বের দাবি দুর্বল করে (Ikenberry 59)।

এই দ্বিচারিতা উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য গভীর সংকেত বহন করে। আন্তর্জাতিক আইন যখন শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ অনুযায়ী নির্বাচিতভাবে প্রয়োগ হয়, তখন তার সার্বজনীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। গ্রিনল্যান্ড ইস্যু দেখায় যে পশ্চিমা শক্তিগুলো নিজের স্বার্থে নীতিকে নমনীয় করে নিতে প্রস্তুত (Dodds 54)। এর ফলে পশ্চিমা নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং উন্নয়নশীল ও ছোট রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সন্দেহ বাড়ে। দীর্ঘমেয়াদে এই প্রবণতা বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে এবং শক্তি-ভিত্তিক রাজনীতিকে আরও স্বাভাবিক করে তোলে। গ্রিনল্যান্ড ও ইউক্রেন এই দুই ইস্যু একসঙ্গে দেখলে স্পষ্ট হয় যে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা একটি নৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

গ্রিনল্যান্ড দখলের বৈশ্বিক প্রভাব : গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য দখল বা কার্যকর আধিপত্য কেবল একটি আঞ্চলিক ঘটনা হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং এটি বৈশ্বিক শক্তি রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। এই অধ্যায়ে গ্রিনল্যান্ড ইস্যুর সম্ভাব্য বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া ও তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে আর্কটিক অঞ্চলে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হবে। রাশিয়া ইতোমধ্যেই আর্কটিকে সামরিক ঘাঁটি সম্প্রসারণ এবং নৌ ও বিমান শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজের অবস্থান শক্ত করেছে

(Young 12)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধিকে রাশিয়া সরাসরি কৌশলগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখবে এবং পাল্টা শক্তি প্রদর্শনে আরও সক্রিয় হবে।

চীনও পিছিয়ে থাকবে না। আর্কটিক অঞ্চলে 'পোলার সিল্ক রোড' ধারণার মাধ্যমে চীন যে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত উপস্থিতি গড়ে তুলতে চায়, গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া প্রভাব তা বাধাগ্রস্ত করবে। এর ফলে চীন বিকল্প আর্কটিক অংশীদার বা নতুন কৌশল গ্রহণে বাধ্য হতে পারে (Lanteigne 94)। এই পাল্টা কৌশল আর্কটিককে সহযোগিতার অঞ্চল থেকে সংঘাতের সম্ভাব্য ক্ষেত্র হিসেবে রূপান্তরিত করতে পারে।

গ্রিনল্যান্ড দখল বা কার্যকর নিয়ন্ত্রণ যদি সফল হয়, তবে এটি বৃহৎ শক্তিগুলোর আচরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নির্দেশ করবে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো বুঝতে পারবে যে কৌশলগত প্রয়োজনের অজুহাতে বিদ্যমান ভূখণ্ডগত ব্যবস্থা প্রশ্লবিদ্ধ করা সম্ভব। এই প্রবণতা আঞ্চলিক সংশোধনবাদকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করে তুলবে (Dodds 56)। এর ফলে অন্যান্য বৃহৎ শক্তিও নিজেদের প্রভাববলয়ের বাইরে থাকা অঞ্চলগুলোর ওপর দাবি জোরালো করতে উৎসাহিত হতে পারে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

গ্রিনল্যান্ড ইস্যু ছোট রাষ্ট্র ও স্বশাসিত অঞ্চলগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি থাকলেও বাস্তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থ সেই নীতিকে ছাপিয়ে যেতে পার গ্রিনল্যান্ড তার একটি উদাহরণ (Gad 129)। এই পরিস্থিতিতে ছোট রাষ্ট্রগুলো নিজেদের নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। স্বশাসিত অঞ্চলগুলোর স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা সীমিত হতে পারে, যা বৈশ্বিক রাজনীতিতে ক্ষমতার অসমতা আরও প্রকট করে তুলবে।

সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়বে নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ওপর। যদি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো নিয়মকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করে, তবে আন্তর্জাতিক আইন ও বহুপাক্ষিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে (Ikenberry 61)। গ্রিনল্যান্ড ইস্যু দেখায় যে শক্তির রাজনীতি আবারও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কেন্দ্রে ফিরে আসছে। দীর্ঘমেয়াদে এটি একটি অনিশ্চিত ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে, যেখানে নীতি নয়, বরং শক্তিই শেষ কথা বলবে।

উপসংহার : এই গবেষণায় গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ন্যাটোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বৈশ্বিক রাজনীতিতে দ্বিচারিতার বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, গ্রিনল্যান্ড শুধুমাত্র একটি স্বশাসিত অঞ্চল নয়, বরং একবিংশ শতাব্দীর ভূরাজনীতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কেন্দ্রবিন্দু। যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ মূলত আর্কটিক অঞ্চলে তার সামরিক ও নিরাপত্তা অবস্থান শক্তিশালী করা, রাশিয়ার প্রভাব সীমিত করা এবং চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি মোকাবিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

গবেষণার প্রধান অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তববাদী নিরাপত্তা চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সার্বভৌমত্ব বা আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিকে প্রায়ই গৌণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে গ্রিনল্যান্ড ইস্যু ন্যাটোর ভেতরে একটি সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব উন্মোচিত করেছে। একদিকে ন্যাটো সমষ্টিগত নিরাপত্তা ও সদস্য রাষ্ট্রের সমতার কথা বলে, অন্যদিকে শক্তিশালী সদস্য রাষ্ট্রের চাপ ছোট রাষ্ট্রগুলোর জন্য আস্থার সংকট সৃষ্টি করেছে। এর ফলে বৈশ্বিক রাজনীতিতে একটি স্পষ্ট দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে নীতির প্রয়োগ পরিস্থিতি ও স্বার্থভেদে পরিবর্তিত হয়।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই গবেষণা বাস্তববাদ ও উদারবাদের মধ্যকার বিতর্ককে নতুনভাবে মূল্যায়নের সুযোগ দিয়েছে। গ্রিনল্যান্ড প্রসঙ্গে বাস্তববাদী কৌশলই যে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে, তা স্পষ্ট হলেও উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নৈতিক দাবি ও নিয়মভিত্তিক কাঠামো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। একই সঙ্গে জোট রাজনীতির ক্ষেত্রেও নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, যেখানে জোটের ভেতরের ক্ষমতার অসমতা এবং নেতৃত্বের coercive প্রবণতা গুরুত্ব পাচ্ছে।

নীতিগত সুপারিশের ক্ষেত্রে এই গবেষণা তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছে। প্রথমত, ন্যাটোর কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন, যাতে ছোট সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। দ্বিতীয়ত, আর্কটিক অঞ্চলের জন্য একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি, যা কেবল বড় শক্তির নয়, বরং আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর

স্বার্থও বিবেচনা করবে। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রতি বাস্তব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা প্রয়োজন, নচেৎ নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

Bibliography:

- Ackren, Maria. *Greenlandic Identity and Self-Government*. Nordic Academic Press, 2014, pp. 90-102
- AMAP. *Arctic Climate Change Update 2021*. Arctic Monitoring and Assessment Programme, 2021, pp. 10-20
- BBC News. “Trump Confirms Plan to Buy Greenland Is Not a Joke.” *BBC News*, 18 Aug. 2019, [www.bbc.com/news/world-us-canada-49367792] (<http://www.bbc.com/news/world-us-canada-49367792>).
- Dodds, Klaus. *Geopolitics: A Very Short Introduction*. 2nd ed., Oxford UP, 2019, pp. 40-58
- Gad, Ulrik Pram. “Greenland: Self-Rule, Independence, and the Arctic.” *Arctic Review on Law and Politics*, vol. 7, no. 2, 2016, pp. 115-130
- Ikenberry, G. John. *A World Safe for Democracy: Liberal Internationalism and the Crises of Global Order*. Yale University Press, 2020, pp. 55-63
- Lanteigne, Marc. “China’s Emerging Arctic Strategies.” *The Arctic Yearbook*, 2019, pp. 85-96
- Mearsheimer, John J. “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault.” *Foreign Affairs*, vol. 93, no. 5, 2014, pp. 77-84
- NATO. *NATO Handbook*. NATO Public Diplomacy Division, 2018, pp. 25-30
- United Nations. *Charter of the United Nations*. United Nations, 1945, [www.un.org/en/about-us/un-charter] (<http://www.un.org/en/about-us/un-charter>)
- Webber, Mark. *NATO: The United States, Transformation and the War in Afghanistan*. Palgrave Macmillan, 2012, pp. 60-75
- Young, Oran R. “The Arctic in World Affairs.” *Arctic Circle Assembly Report*, 2018, pp. 9-12. 11-13
- Young, Oran R. “The Arctic in World Affairs: A North Pacific Dialogue on Arctic 2030.” *Arctic Circle Assembly Report*, 2018, pp. 1-12